কুন্তী : দুঃখ-তপে নিকষিত হেম

সুমনা সাহা

সাহিত্যসেবী ও সুলেখিকা

মহাভারত ভারতেরই মর্মগাথা। লোকমুখে ফেরে, 'যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে'। প্রথম 'ভারত' অর্থে মহাকাব্য, এবং দ্বিতীয়টি ভূখণ্ড—ভারতীয় উপমহাদেশ। আঠারোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত মহাভারতে অসংখ্য চরিত্র, ঘটনার অজস্র বাঁক, ড্রামা ও ট্র্যাজেডির নাটকীয় চমকে গাঁথা হয়েছে এক বিস্ময়কর গাথা, যা যুগ যুগ ধরে মানুষকে শিখিয়ে চলেছে রাজনীতি, সমাজনীতি, কূটনীতি, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম, নীতি-দুর্নীতির প্রয়োজনীয় পাঠ। মহাকাব্যকাররা তাঁদের রচনায় গহিন অরণ্যের রহস্যের মতোই রেখে যান অনেক অমীমাংসিত কাহিনি, সৃষ্টি করে যান কৌতূহলের নানা ফাঁক-ফোকর। অরণ্যের যেখানে ভাল করে সূর্যকিরণ প্রবেশ করতে পারে না, সেই গাছগাছালির ছায়াময় নিবিড় কুহেলিকায় অবাধে প্রবেশ করতে পারেন পাঠক, আলোচক, অনুসন্ধিৎসু এবং প্রত্যেকেই নিজের বোধ অনুসারে সেখান থেকে কুড়িয়ে নিতে পারেন মহীরুহের শাখাচ্যুত কয়েকটি পত্র, পুষ্প কিংবা সুপক্ক ফল। মহাভারতকার স্থির নির্দেশ দিয়ে যাননি, ''দেখো বাপু, আমি এই চরিত্রকে ঠিক এমন করেই এঁকেছি, এটাই আমার একান্ত অভিপ্রায়'', বরং ভালমন্দ ব্যাখ্যা করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি পরবর্তী প্রজন্মের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর চরিত্ররা কেউ নিখুঁত নন, দোষেগুণে ভরা নিতান্তই মানুষ। তিনি রানি

হোন বা পরিচারিকা, আচার্য কিংবা সৈনিক—ন্যায়নীতির বোধ, ক্ষমা ও উদারতার সঙ্গে সঙ্গে মহাকবি তাঁদের মানবোচিত দুর্বলতাগুলিও যত্ন করে এঁকেছেন। তাই এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি অবলম্বন করে আজ মহাভারতের মহারণ্য থেকে ভাগ্যের হাতে পরাজিত বা পরিস্থিতির শিকার এক মহারানির জীবনকে দেখার সাহস করছি। কুন্তী এক অসাধারণ চরিত্র। রাজকন্যা হয়ে জন্মেও অন্তরে নিঃসঙ্গ। জন্মদাতা পিতা আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তাঁকে দান করেন আর-এক রাজাকে। সেখানে পিতৃস্নেহ পেলেও অন্তঃপুরে মাতা না থাকায় মাতৃস্নেহহীন বাল্যকাল কাটল তাঁর। কুন্তীর সমগ্র জীবনটিই এক অনিঃশেষ দুঃখের তপস্যা। কুন্তী একাধারে মনস্বিনী ও তপস্বিনী, ব্যক্তিত্বময়ী ও মমতাময়ী। প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চসতীর অন্যতমা মহারানি কুন্তী; যাঁরা প্রত্যেকেই সততা, নৈতিকতা, তেজস্বিতা, বুদ্ধিমত্তা, মর্যাদাবোধ, কালোচিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণাবলির নিরিখে জনমানসে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত।

নষ্ট শৈশব

মহাভারতের আদিপর্বে, অংশাবতরণ পর্যায়ে ব্যাসদেব জানিয়েছেন, সিদ্ধি ও ধৃতি নামের দেবীরা মর্তে কুন্তী ও মাদ্রীরূপে অবতরণ করেন। সিদ্ধি দেবীই যদুবংশীয় শূররাজার কন্যা 'পৃথা'। রাজা শূর, পিসতুতো ভাই নিঃসন্তান কুন্তিভোজের কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন, নিজের প্রথম সন্তানটি দান করবেন। তাই তিনি তাঁকে নিজের পৃথা নাম্নী প্রথমা কন্যাকে দান করলেন। কুন্তিভোজ আপন নাম অনুসারে অতুলনীয়া সুন্দরী কন্যার নাম রাখলেন কুন্তী। নিজের পরিবেশ, পরিবার সবকিছু ছিন্ন করে শৈশবে দূর রাজত্বে অন্য পরিবারে পাকাপাকিভাবে চলে আসা, অন্য ব্যক্তিকে পিতাজ্ঞানে ভালবাসতে পারা ও সেই পরিবারকে আপন করে নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে নিশ্চয় তাঁকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। কুন্তিভোজের পত্নীর উল্লেখ কোথাও নেই বলে গবেষকেরা অনুমান করেন তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়েছিল। পালক পিতা তাঁকে অন্দরমহলের সর্বময়ী কর্ত্রীর অধিকার দিয়েছিলেন বোঝা যায়, যেহেতু তিনি কোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্বাসার সেবার সম্পূর্ণ ভার কুন্তীর উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। দুর্বাসা অত্যন্ত বদরাগী, কথায় কথায় শাপ দেন। সৎকারে ত্রুটি ঘটলে রাজবংশ ধ্বংস হবে। কিন্তু কুন্তী দায়িত্ব পালন করলেন নিশ্ছিদ্র সেবায়, অনায়াস আন্তরিকতায়। ঋষিও প্রসন্ন হলেন।

অবশেষে দুর্বাসার বিদায়ের সময় এল। এক মুহূর্তের জন্যও ঋষি কুন্তীর মধ্যে সেবাপরাধ জনিত সমালোচনার একটি বিন্দুও খুঁজে পাননি। তাই দুর্লভ কোনও বর দিতে চাইলেন তাঁকে। সে-বর কুন্তীর আদৌ অভিপ্রেত কী না, তা জেনে নেওয়ার কথা তিনি ভাবতেই পারেননি। এক গোপন মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন, ওই অব্যর্থ মন্ত্রের উচ্চারণে যেকোনও দেবতা উপস্থিত হবেন এবং তাঁর মাধ্যমে কুন্তী লাভ করবেন শ্রেষ্ঠ পুত্রসন্তান। আজও প্রাচীনকালের সমস্ত ব্রতকথাতেই নারীর শ্রেষ্ঠ কামনারূপে পাই পতিসুখ ও পুত্রসুখ। দুর্বাসা কুন্তীকে তা-ই দিয়ে গেছেন।

মহর্ষি দুর্বাসাকে সেবা দ্বারা তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে বর লাভ করা—অসম্ভবের দ্বিতীয় নাম। কুন্তী তাতে সফল হলেন। অথচ তিনি তখন সংসারের জটিল হিসেবনিকেশে অনভিজ্ঞা নিতান্তই এক সরলা কিশোরী। তিনি রাজকন্যার সম্মান ও ক্ষমতা পেয়েছেন, কিন্তু তাঁকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়ার কেউ নেই। দাসীরা তাঁর হুকুম তামিল করেন, কিন্তু বয়ঃসন্ধির কিশোরীকে উপযুক্ত পরামর্শ দেবে এমন সখী বা গুরুজন তিনি পাননি। সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, কিন্তু 'মা' ছিলেন না। নিজের কিশোরীমনের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা, ভয়,

লজ্জা কিছুই তিনি কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেননি। সকল আশীর্বাদ ফলপ্রসূ হওয়ার একটি কালাকাল থাকে। বিধবার পুত্রলাভ যেমন সমাজে নিন্দনীয়, তেমনই কুমারী কন্যার পুত্রলাভও কলঙ্কজনক। কিন্তু কুন্তীকে এই সৎ-অসৎ শিক্ষা দেবেন কে? তিনি সখীহীন; প্রিয়সখী থাকলে হয়তো সে বলে দিত, ''এই মন্ত্র স্মরণে রেখে দিস, ভবিষ্যতে যদি কাজে লাগে।'' তিনি মাতৃহীন; মা থাকলে হয়তো শঙ্কিত হয়ে বলতেন, ''ওরে এ-সর্বনাশা মন্ত্র মনে রাখিস নে মা, ভুলে যা।''

দুর্বাসার বরের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা কিশোরীর স্বাভাবিক কৌতূহল তাঁকে প্ররোচিত করল বরের সত্যতা যাচাই করতে।

''এবমুক্তা চ সা বালা তদা কৌতূহলান্বিতা।
কন্যা সতী দেবমর্কমাজুহাব যশস্বিনী॥''

(আদিপর্ব, ৬২।১৩৭)

চোখের সামনে নিত্য যাকে সহস্রোজ্জ্বল কিরণমালা নিয়ে পূর্ব দিগন্তে উদিত হতে দেখেন, বিশ্বের প্রাণস্বরূপ সেই সূর্যমণ্ডলস্থিত তেজস্বী পুরুষকে কল্পনা করে আহ্বান করলেন কুন্তী। মহর্ষি দুর্বাসার বর অব্যর্থ। সূর্যদেব উপস্থিত হলেন। কুন্তী ততক্ষণে তাঁর বিপদ আঁচ করতে পেরেছেন। তিনি সূর্যকে মিনতি করে বললেন, ''কৌতূহলবশে আপনাকে আহ্বান করেছি। বরের সত্যতা পরখ করে আমি সন্তুষ্ট। আপনি এখন দয়া করে ফিরে যান।'' কিন্তু দেবতার কৃপা অমোঘ। কর্মের ফলের মতোই সাধনার সিদ্ধিও অনিবার্য। কুমারী কুন্তী কবচকুণ্ডলধারী সূর্যসম প্রভাময় এক পরম তেজস্বী পুত্রের জন্ম দিলেন। কানীন বলে তাকে কাছে রাখতে পারলেন না, ভাসিয়ে দিতে হল গঙ্গায়। তারপর থেকেই এল তাঁর মনস্তাপ ও অপরাধবোধ, যে-বেদনা আজীবন তিনি বহন করেছেন।

একটি কথার জন্য

পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীকে স্বয়ংবরের কঠিন পরীক্ষায় জিতে বরমাল্য লাভ করলেন অর্জুন। ব্রাহ্মণবেশী বনবাসী পাঁচ রাজপুত্র কুটিরে ফিরে এসে দ্বারপ্রান্ত থেকে অভ্যাসবশত মাকে হেঁকে বললেন, ''ভিক্ষা এনেছি মা!'' কুন্তীও অভ্যাস-বশেই বলে ফেললেন, ''যা এনেছ, পাঁচ ভাই ভাগ করে নাও!'' কিন্তু এ যে আশ্রমবাসী পুরুষের ভিক্ষালব্ধ অন্ন নয়, এ এক নারী, যাকে লাভ করেছেন অর্জুন। মহাভারতকার এই একটি অংশেই যে কত অসংখ্য আলোচনার বীজ রেখে গিয়েছেন, তা অভাবনীয়। প্রথম, ভিক্ষা কেন বললেন? নারী কি নিতান্তই ভিক্ষালব্ধ বস্তু? দ্বিতীয়, কুন্তী যদি না জেনে একটি কথা বলেই ফেলে থাকেন, তাকে এত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে হবে কেন? আসলে মহাভারতকার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যজ্ঞাগ্নিসম্ভূতা অসামান্যা এই নারী, যাঁকে পাওয়ার জন্য দেশদেশান্তরের রাজাদের মধ্যে এত সংগ্রাম, তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছা অর্জুনের অন্য ভাইদেরও হয়েছিল এবং সেই ইচ্ছাপূরণের একটি অলৌকিক উপায় খুলে দিয়েছেন কুন্তী অজান্তেই, এবং এই ইচ্ছাপূরণে 'মাতৃআজ্ঞা পালন'কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে বলেই কেউ খুব একটা প্রতিবাদ করেননি। দ্রৌপদীকে দেখামাত্রই কুন্তী বুঝলেন, একটি নিদারুণ ভুল বাক্য বলে ফেলেছেন। ধর্মজ্ঞ জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁর বড় ভরসার জায়গা। তিনি দ্রৌপদীর হাত ধরে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, ''তুমিই স্থির করো, কী করলে আমার মিথ্যাভাষণের অপরাধ হয় না এবং এই রাজকুমারীকেও পাপকর্ম হেতু নীচযোনিতে জন্ম নিতে না হয়?'' এই কথায় যুধিষ্ঠির দুদণ্ড ভাবলেন। তৎক্ষণাৎ বললেন না যে, ''ও কি একটা কথা হল? অর্জুনই তো দ্রৌপদীর স্বামী।'' কারণ তিনি ভাইদের মুখগুলি দেখেছেন।

তাঁদের সকলের প্রাণে দ্রৌপদীকে লাভ করার ইচ্ছা জেগে উঠেছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির পাঞ্চালীকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃবিরোধেরও আভাস পেলেন। তবুও বললেন, ''এখন যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করে অর্জুন বিধিসম্মতভাবে পাঞ্চালীর পাণিগ্রহণ করুক, এটাই ঠিক হবে।'' কিন্তু বাধ সাধলেন অর্জুন স্বয়ং। তিনি যুক্তি দিলেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতা অবিবাহিত থাকতে কনিষ্ঠ কীভাবে বিবাহ করতে পারে? এতে অধর্ম হবে। অথচ এমন একটি অধর্ম আগেই ঘটে গেছে, যখন ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বার বিবাহ হয়েছে।

সব সমস্যায় এক কৃষ্ণই ভরসা। তিনি এসে, বিচিত্র গুণসম্পন্ন স্বামী পাওয়ার জন্য পূর্বজন্মে দ্রৌপদীর তপস্যার কথা বললেন; জানালেন যে একই পুরুষে ওই পাঁচটি গুণ থাকা সম্ভব নয় বলে এ-জন্মে তাঁকে পঞ্চপতি নিয়েই ঘর করতে হবে। দ্রৌপদী হলেন পঞ্চপতির ভার্যা। যাতে ভ্রাতাদের মধ্যে অসদ্ভাবের জন্ম না হয়, তার জন্য তৈরি হল নিয়ম। এক পতির সঙ্গে সময় অতিবাহিত করার নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অন্য কোনও পতি সেই চৌহদ্দিতে প্রবেশ করতে পারবেন না; এই নিয়ম লঙ্ঘিত হলে তাঁকে বারো বছরের জন্য পরিচয় গোপন রেখে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে যেতে হবে। লক্ষ্যভেদে বিজয়ী অর্জুনের স্ত্রী দ্রৌপদী প্রথমেই হলেন যুধিষ্ঠির-ঘরনি; এরপর নিয়তির বিধানেই নিয়মভঙ্গ করলেন অর্জুন ও বনে গেলেন। বারো বছর পরে অর্জুন ফিরে এলেন কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করে সঙ্গে নিয়ে। ততদিনে দ্রৌপদী চার স্বামীর সঙ্গে ঘর করে চারটি সন্তানের জননী হয়েছেন। ভাগ্যের কী নিদারুণ পরিহাস! আর এ-সমস্ত কিছুর নেপথ্যে কুন্তীর একটি বেফাঁস মন্তব্য। কুন্তী কি নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পেরেছেন? যদিও তাঁকে পুত্ররা ও দ্রৌপদী কখনও দোষারোপ করেননি, কিন্তু তিনি নিজেই অসতর্ক মন্তব্যের জন্য এতগুলি দুঃখজনক ঘটনার নিয়ন্ত্রী হয়ে প্রবল মনস্তাপে দগ্ধ হয়েছেন।

পুত্রদের বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত কুন্তী তাঁদের ছায়াসঙ্গিনী ছিলেন। অথচ দ্রৌপদীর আগমনের পরেই শ্বশ্রূমাতাসুলভ যথাযোগ্য উপদেশাদি দান করে গৃহকর্ত্রীর পূর্ণমর্যাদায় দ্রৌপদীকে প্রতিষ্ঠিত করে নিজে পাদপ্রদীপের আলো থেকে সরে এসেছেন। দ্রৌপদীর সঙ্গে একটি দিনের জন্যও কুন্তীর মনোমালিন্যের ছায়াও মহাভারতে পাই না। শাসন ও সোহাগে সংসারকে বেঁধে রাখার যে-ভূমিকা এক মায়ের, ঠিক সেইটিই তাঁর পুত্রবধূকে হস্তান্তরিত করার ঔচিত্যবোধ কুন্তীর মধ্যে ছিল অনায়াস ও সাবলীল। অপূর্ব শিক্ষণীয় এই আচরণ।

স্বামীর ইচ্ছাপূরণের যন্ত্র

রানি কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে রাজা পাণ্ডু যখন বনবাসে, তখন একটি অনভিপ্রেত ঘটনায় তিনি এক মুনির শাপে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হারালেন। পুত্রাভিলাষী পাণ্ডু শাস্ত্রকারদের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য কুন্তীকে অনুনয় করতে লাগলেন : ''তুমি আমার নিয়োগ অনুসারে কোনও তপস্বী ব্রাহ্মণের থেকে গুণবান পুত্র উৎপাদন করো; তোমার জন্যই যেন আমি পুত্রবানদের গতি লাভ করতে পারি।'' কুন্তীর জীবন বারংবার কারও না কারও ইচ্ছার অধীনেই চালিত হয়ে চলল। তাঁর অন্তর সায় দিল না, তথাপি পাণ্ডু নানা পৌরাণিক ঘটনার উদাহরণ দিয়ে বারবার আদেশ করতে লাগলেন। কুন্তী তখন দুর্বাসার মন্ত্রের কথা তাঁকে জানালেন। পাণ্ডুর ইচ্ছানুসারে কুন্তী একের পর এক ধর্মরাজ, বায়ুদেবতা ও দেবরাজ ইন্দ্রকে মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে পুত্ররূপে লাভ করলেন।

পাণ্ডু চতুর্থবার অনুরোধ করলে কুন্তী অস্বীকৃত হন। পাণ্ডু ও মাদ্রীর অনুরোধে তিনি সেই গোপ্য মন্ত্রটি মাদ্রীকে দান করেন এবং বুদ্ধিমতী মাদ্রী

একসঙ্গে যমজ সন্তান প্রাপ্তির আশায় দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করে নকুল-সহদেবকে পুত্ররূপে লাভ করেন। যদিও কুন্তীর জন্যই পাণ্ডু পুত্রের পিতা হওয়ার গৌরব লাভ করলেন, তবু বোধ করি কুন্তীর সঙ্গে তাঁর সখ্যের চেয়েও বেশি সম্বন্ধ ছিল দাবির। পাণ্ডুর প্রণয় লাভ করেছিলেন মাদ্রী, তার পরিণামও পাণ্ডু জীবন দিয়ে শোধ করলেন। তখন সহমরণে যাওয়া ছিল গৌরবের—কিন্তু কুন্তী প্রথমা পত্নী হয়েও সেই গৌরবাধিকার মাদ্রীকে ছেড়ে দিলেন, কেবল সন্তানদের সুষ্ঠুভাবে মানুষ করবেন বলে। এমনকী মাদ্রীও কুন্তীর মাতৃত্বের সমদর্শিতার প্রতি নিজের থেকে বেশি আস্থা রেখেছিলেন। পতিবিয়োগের দুঃখ, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত, অসহনীয় বনবাস, সন্তান হারানোর দুঃখ—এসমস্ত থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেলেন মাদ্রী, পাণ্ডুর সহগামিনী হয়ে। মহাকাব্যের জটিল আবর্তে সমালোচনার আতসকাচের নিচে পড়ে রইলেন কুন্তী। এরপর পাঠক তাঁকে কূটনীতিজ্ঞ বলবেন, রাজনীতির খেলায় তুখোড় বলবেন, ক্ষমতালিপ্সার অভিযোগও তুলবেন তাঁর প্রতি। যতক্ষণ না কৃষ্ণের উদ্দেশে কুন্তী স্তব করছেন, ততক্ষণ যেন তাঁর চরিত্রের সুপ্ত দিকটি প্রকাশ্যে আসে না। অন্তিমে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর হাত ধরে বনবাসী কুন্তীর তপস্যা ও দাবানলে স্বেচ্ছামৃত্যু তাঁর চরিত্রের শুদ্ধতা, অকলঙ্কতা ফুটিয়ে তুলেছে।

পরিত্যক্ত সন্তানের জন্য আজীবন অন্তর্দাহ

কুন্তীর জীবনের অন্যতম বিড়ম্বনা হল নিজের কানীন সন্তানের কাছে আত্মপরিচয় প্রদান। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনটি থেকেই তার গর্ভধারিণীকে একান্ত আপনার করে পায়। কিন্তু কুন্তী তাঁর প্রথম সন্তানকে লোকলজ্জার খাতিরে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে-দুঃখ তিনি আজীবন বহন করেছেন। পঞ্চপুত্রের কণ্ঠে 'মা' ডাক শুনেও একটি অভাগা সন্তানের 'মা' ডাকার অধিকার লোপ করবার দুঃখে গোপনে রক্তাক্ত হয়েছেন; নিজের সন্তানের ও সন্তানসম পরিজনদের অকাতরে স্নেহবর্ষণ করেও সন্তপ্ত থেকেছেন একটি শিশুকে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করার জন্য। এই অসহনীয় দুঃখ তাঁর একান্ত নিজস্ব। এই বেদনার ভার তিনি কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেননি। সদ্যোজাত শিশুটিকে নিঃসন্তান দম্পতি সূত অধিরথ ও রাধা সযত্নে বুকে তুলে নিয়ে পরম আদরে লালনপালন করেছিলেন। তাই শিশুর মনে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ তৈরি হয়নি। তিনি সূতপুত্র ও রাধেয় পরিচয়ে বড় হয়ে উঠেছেন। উদ্যোগপর্বে কর্ণ প্রথম কৃষ্ণের কাছ থেকে নিজের প্রকৃত পরিচয় জানলেন। যে-দুঃখ কুন্তীর নিত্যসঙ্গী ছিল, কর্ণের কাছে তার প্রতিক্রিয়া একইরকম নয়। তা হতে পারে না। তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর নিজস্ব বৃত্তে স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতার স্নেহযত্ন আছে, দুর্যোধনের উদার বন্ধুতা আছে। তিনি রাজমিত্র, বীর, স্বনামধন্য দাতা। তাঁর অপ্রাপ্তি বা অভাবের কোনও বোধ ছিল না। বরং সত্য-প্রকাশে যে-নতুন অনুভব পেলেন কর্ণ, তা দুঃখের থেকে অনেক বেশি অস্বস্তির, বিভ্রান্তির—যা তাঁকে এক ধর্মসংকটে উপনীত করল। কুন্তীর অকস্মাৎ এই পরিচয়দানে অন্য অভিসন্ধিও খুঁজে পেলেন তিনি। অসহায় নারীর অশ্রু তাঁকে শেষ পর্যন্ত অর্জুন ভিন্ন অন্য পাণ্ডবদের অনিষ্ট না করার প্রতিশ্রুতিতেও বদ্ধ করল।

কুন্তীর প্রয়াস একাংশে ব্যর্থই হল। কারণ দুর্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কর্ণ এই দুঃসময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি নন, কৌরব-পক্ষেই লড়বেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যুদ্ধভূমিতে বীরোচিত মৃত্যুই তাঁর একান্ত কাম্য। কুন্তী ফিরে গেলেন। কিন্তু তাঁর অব্যক্ত যন্ত্রণা পূর্বাপেক্ষা তীব্রতর হল। যুদ্ধে মৃত্যু হল কর্ণের। কুন্তী কাঁদতে পারলেন না, অশ্রু লুকিয়ে রাখতে হল। কাপড়ে

মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন কুন্তী, পুত্রদের ক্ষতস্থানে বারবার সস্নেহে হাত বুলিয়ে জ্যেষ্ঠপুত্রের শোক ভুলতে চাইলেন। দ্রৌপদী মাটিতে লুটিয়ে কাঁদছেন; কুন্তীকে বললেন, ''মা! সুভদ্রার ছেলে অভিমন্যু, আপনার অন্য নাতিরা সব কোথায় গেল? কই, আজ তারা তো কেউ এল না আপনার কাছে। আমার ছেলেরা কেউ বেঁচে রইল না, আমি এই রাজ্য দিয়ে আর কী করব! 'কিং নু রাজ্যেন বৈ কার্যং বিহীনায়াঃ সুতৈর্মম।' '' (স্ত্রীপর্ব, ১৫।১৩) কুন্তীও যে পুত্রহারা, কিন্তু তা কে জানবে? শোক গোপন করে কুন্তী পুত্রবধূর সঙ্গে শোকে একাত্ম হলেন। দ্রৌপদীকে দুহাতে ধরে উঠিয়ে সান্ত্বনা দিলেন।

যুদ্ধের পর সত্য প্রকাশ করায় অন্য পুত্রদের চোখেও কুন্তী ছোট হয়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির তিরস্কার তো করলেনই, নারীরা আর কোনও কথা গোপন রাখতে পারবে না—এই অভিশাপও দিলেন। যে-দুঃখ দীর্ঘকাল হৃদয়ে লালন করেছিলেন কুন্তী, এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তা সর্বসমক্ষে এসে তাঁকে অনেকগুলি অভিযোগের তীরের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল।

কর্ণের শোকবহ্নি কুন্তী বানপ্রস্থেও সঙ্গী করে নিয়েছিলেন, তা দেখছি যখন সেখানে দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডব গেলেন ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সেইসময় উপস্থিত মহামতি ব্যাস কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''বলো তুমি কী চাও, আজ আমি তোমার মনের সব ইচ্ছা পূর্ণ করব।'' সর্বসমক্ষে সেদিন কুন্তী সমস্ত শঙ্কা, লজ্জা সরিয়ে রেখে নিজের পূর্বকথা প্রকাশ করে বলেছিলেন, ''সেদিন যাকে আমি আপন পুত্র জেনেও অবহেলা করেছি, ভাসিয়ে দিয়েছি জলে, তার জন্য আমার শরীর-মন সবসময় জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। আমার পাপ হয়েছে না হয়নি, সেসব কিছুই জানি না। কেবল আমার সেই ছেলেকে একটিবার দেখতে চাই—আপনিই তাকে দেখাতে পারেন।''

মৃত সকল আত্মীয়-পরিজনকে ব্যাস যোগবলে দেখিয়েছিলেন। তাঁদের দেহ অক্ষত, মনে অসূয়া, ঈর্ষা বা মালিন্যের চিহ্নমাত্র নেই—'নির্বৈরা নিরহংকারা বিগতক্রোধমৎসরাঃ।' (আশ্রমবাসিক পর্ব, ৩৫।১৫) জীবিত অবস্থায় যাঁর যেমন বেশ, রথ, বাহন ছিল, ঠিক সেভাবেই রথে বা ঘোড়ায় চেপে তাঁরা উপস্থিত হলেন। ভাগীরথীতীরে কর্ণকে দেখামাত্র পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ধেয়ে গেলেন তাঁর দিকে—'সম্প্রহর্ষাৎ সমাজগ্মুঃ।' পরস্পরকে স্বাভাবিক ভ্রাতৃস্থানে পেয়ে খুশি হলেন তাঁরা। এই দৃশ্যই এক মায়ের কাঙ্ক্ষিত। কুন্তী যে-আর্তি নিয়ে একদা কর্ণের কাছে গিয়েছিলেন—পাঁচ নয়, ছয় ভাই যেন এক অভেদ্য সৌহার্দ্যে বাঁধা পড়ে—এই বাসনাপূরণে সেদিন কুন্তীর সকল যন্ত্রণার অবসান হয়েছিল।

এক নিরাসক্ত তপস্বিনী

কুন্তীর সমগ্র জীবন জুড়ে যে-ট্র্যাজেডি, তার জন্য বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিতভাবে দায়ী এক অর্থে তিনি নিজেই। মহর্ষি দুর্বাসার বরকে ঘিরেই কুন্তীর জীবন সর্বাপেক্ষা আলোচিত। আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ না করে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই বরপ্রাপ্তিকে দেখা যায়। সুদৃঢ় তপস্যা ও সাধুসেবা দ্বারা কুন্তী লাভ করেছিলেন সূর্যপ্রভাসম দিব্যদীপ্তি। সেই তেজোময় তপঃপুঞ্জই তাঁর সিদ্ধি অর্থাৎ তাঁর সন্তান কর্ণ। ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে সাধুসেবায় তিনি ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব জেনেছিলেন, তাই সাক্ষাৎ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে লাভ করেছিলেন। যুদ্ধে যিনি স্থির, তিনিই যুধিষ্ঠির। সন্তান যেন সিদ্ধিসম প্রাপ্তি। দুঃখ ও সমস্যার পাহাড় ভেঙে পড়লেও কুন্তী শান্তভাবে সব সহ্য করেন, এই তিতিক্ষা তাঁর ধর্মপ্রাণতারই পরিচায়ক।

ধর্মে অটল বা সংসারযুদ্ধে স্থির কুন্তী হয়ে উঠলেন অসীম আধ্যাত্মিক শক্তির আধার।

দেহমধ্যস্থ পঞ্চবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে লাভ করলেন পবনপুত্র ভীমকে। শ্রীরামকৃষ্ণ যোগের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, ''বায়ু স্থির হলে কুম্ভক আপনি হয়।'' কুম্ভকের অর্থ হল দেহে ক্রিয়াশীল প্রাণ-অপান-উদান-ব্যান-সমান এই পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চমহাবায়ু নিরোধ দ্বারা দেহের সকল ক্রিয়া রোধ করে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার থেকে আকর্ষণ করে সুষুম্নাপথে ঊর্ধ্বগামী করে সহস্রারে মিলিত করা। যোগিজনদুর্লভ এই কুম্ভক কুন্তী আয়ত্ত করেছিলেন।

অর্জুনের জন্ম দেবরাজ ইন্দ্র থেকে। ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। কুন্তী সংযমে সিদ্ধ হয়েছিলেন। ইন্দ্রিয়নিগ্রহের ফলস্বরূপ একাগ্রচিত্ত কুন্তী তাই প্রাপ্ত হয়েছিলেন সিদ্ধিরূপ 'অর্জুন'। সব্যসাচী তিনি। দুটি হস্ত সমদক্ষতায় তীরনিক্ষেপে সক্ষম। তীর লক্ষ্যভেদ করে। একাগ্রতা লক্ষ্যভেদ বা অভীষ্টসিদ্ধির একমাত্র সাধন। কুন্তী ঐকাগ্র্যে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন।

পরিশেষে সাধকের সকল সাধনার সিদ্ধি লোককল্যাণে নিয়োজিত করাই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তাই মাদ্রীর মাধ্যমে কুন্তী লাভ করলেন দেব-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পুত্রদের—নকুল ও সহদেবকে। বৈদ্য ব্যাধির ঔষধ দেন। প্রতীকী অর্থরূপে নকুল ও সহদেবকে ভবব্যাধির বৈদ্যরূপে ভাবতে পারি।

কুন্তী। মহিমময়ী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিসি এবং মহাবীর পঞ্চপুত্রের জননী। তথাপি আজীবন দুঃখিনী এই রানির জন্য শেষপর্যন্ত পাঠক দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। অথচ এই দুঃখের তপস্যাই কুন্তীর প্রার্থিত। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের শেষে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে প্রত্যাবর্তন করবেন। সেই বিদায়লগ্নে যখন সকলেই তাঁর আশীর্বাদপ্রার্থী, সেইক্ষণে কুন্তী সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিভরে স্তব করলেন ও আজীবন 'দুঃখ'-লাভের বর প্রার্থনা করলেন। কুন্তীর এই অনন্য প্রার্থনা এক মুহূর্তেই চিনিয়ে দেয় তাঁর অন্তর্নিহিত দৈবী সত্তাকে। রাজর্ষি জনক যেমন শ্রেষ্ঠ নৃপতি হয়েও অন্তরে ঋষি, তেমনই রানি হয়েও কুন্তী ঋষিতুল্য প্রজ্ঞাবতী এক মহীয়সী তপস্বিনী।

তিনি বললেন, ''হে হৃষীকেশ, সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ও সর্বেশ্বরেশ্বর, তোমার জননী দেবকীকে ঈর্ষাপরায়ণ কংস দীর্ঘকাল যাবৎ কারারুদ্ধ করে রাখাতে তিনি শোকে অভিভূত হলে তুমি তাঁকে কারামুক্ত করেছিলে, তেমনই তুমি আমাকে এবং আমার পুত্রদের বারবার বিপদরাশি থেকে মুক্ত করেছ।... হে জগদীশ্বর, আমি কামনা করি যেন সেই সমস্ত সংকট বারবার উপস্থিত হয়, যাতে বারবার আমরা তোমাকে দর্শন করতে পারি। কারণ তোমাকে দর্শন করলেই আমাদের আর জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে না।... এই সমস্ত জনপদ সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে কারণ প্রভূত পরিমাণে শস্য ও ঔষধি হচ্ছে, বৃক্ষসমূহ পরিপক্ক ফলে পূর্ণ হয়েছে, নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছে, গিরিসমূহ ধাতুতে পূর্ণ হয়েছে এবং সমুদ্র সম্পদে পূর্ণ হয়েছে। এসবই হয়েছে তোমার শুভ দৃষ্টিপাতের ফলে। হে জগদীশ্বর, হে সর্বান্তর্যামী, হে বিশ্বরূপ, দয়া করে তুমি আত্মীয়স্বজন, পাণ্ডব ও যাদবদের প্রতি আমার গভীর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে দাও। হে মধুপতি, গঙ্গা যেমন অপ্রতিহতভাবে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তেমনই আমার একনিষ্ঠ মতি যেন নিরন্তর তোমাতেই আকৃষ্ট হয়।''

কুন্তীর এই প্রার্থনা কেবল মৌখিক নয়, তা যে কতখানি খাঁটি তার প্রমাণ মেলে মহাভারতের অন্তিমভাগে। পুত্ররা যখন যুদ্ধজয়ী, রাজমাতৃসুলভ সেই গৌরব উপভোগ করার পরিবর্তে তিনি বৃদ্ধ অসহায় অন্ধ ভাসুর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে বানপ্রস্থে গমন করলেন। পুত্রদের কোনও অনুনয়ই শুনলেন না। অথচ তিনিই বীরজননী বিদুলার দৃষ্টান্ত দিয়ে নিজের হতোদ্যম পুত্রদের যুদ্ধে প্ররোচিত

করেছিলেন। নিজেই তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন—আমার স্বামী পাণ্ডুর বংশ যাতে লোপ না পায় সেজন্যই আমি তোমাদের যুদ্ধ করার উপদেশ দিয়েছি। বানপ্রস্থে কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবায় দিন কাটিয়েছেন। যাঁরা সবকটি সন্তান হারিয়েছেন, তাঁদের সমব্যথী হয়ে তাঁদের সেবা করাই তাঁর সমীচীন বোধ হয়েছিল। সেবা ও তপস্যা ছিল কুন্তীর কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই সহজাত ও স্বাভাবিক। উপবাস ও তীব্র কৃচ্ছ্রতায় তিনি আয়ুক্ষয় করে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পুত্রেরা বনে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি তাঁদের কল্যাণকামনা করে ফিরে যেতে বললেন।

ভারতীয় দর্শনে আত্মহত্যা মহাপাপ বলে গণ্য হলেও যোগজ মৃত্যু ও ইচ্ছামৃত্যুর কথা পুরাণে ও স্মার্তমতে পাই। স্মার্ত পণ্ডিতগণও জরাগ্রস্ত কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধি দ্বারা পীড়িত অবস্থায় স্বেচ্ছামৃত্যু ত্বরান্বিত করার বিধান দিয়েছেন বিশিষ্ট কয়েকটি উপায়ের মাধ্যমে। প্রায়োপবেশন ও অগ্নিপ্রবেশ করে, জলে ডুবে অথবা উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে মৃত্যুবরণের বিধান আছে। বানপ্রস্থী ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়কে উপবাসের মাধ্যমে দিন দিন কৃশ থেকে কৃশতর হতে দেখিয়েছেন মহাভারতকার অর্থাৎ তপস্যা-ব্রত-উপবাসের মাধ্যমে স্বেচ্ছামৃত্যুর উপায়ই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। কুন্তীর অন্তিমকালের কথা দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে জানিয়েছিলেন। বনের মধ্যে না-নেভানো হোমের অগ্নি বাতাস পেয়ে দাবানল হয়ে জ্বলে উঠেছিল। তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। বনের হরিণ, বরাহ, সাপ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পালাতে সচেষ্ট হলেও ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর শরীর উপবাসে-অনাহারে এতই অসমর্থ হয়ে পড়েছিল যে তাঁদের পক্ষে স্থানান্তরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রাণ বাঁচানোর জন্য অন্যত্র সরে যেতে বললেন, কিন্তু নিজের এবং গান্ধারী-কুন্তীর দায়িত্ব নিয়ে বললেন—আমরা এখানেই থাকছি এবং এই অগ্নিতে দগ্ধ হয়েই আমরা পরম গতি লাভ করব, ''বয়মত্রাগ্নিনা যুক্তা গমিষ্যামঃ পরাং গতিম্।'' (আশ্রমবাসিক পর্ব, ৪০।২৩) তিনি নিজে ইষ্টদেবতার প্রতি মনঃসংযোগ করে গান্ধারী ও কুন্তীকে বললেন পূর্বমুখ হয়ে তপস্যার আসনে বসতে। কুন্তী সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করে এমনভাবে যোগাসনে বসলেন যে, তাঁকে দেখে মনে হল শুকনো এক নিশ্চল কাঠ পড়ে আছে—''সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামমাসীৎ কাষ্ঠোপমস্তদা।'' (তদেব, ৪০।৩০)

প্রখর আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা, কর্তব্যে অবিচল কুন্তী, যিনি চরম ঐশ্বর্যভোগ থেকে স্বেচ্ছায় সরে গিয়ে বনবাসী বানপ্রস্থীর জীবন বেছে নিয়েছেন, সমস্ত জীবন দুঃখভোগের পরেও যিনি সুখভোগে আসক্তিহীন, সেই নিরাসক্ত যোগিনীসমা মহারানি কুন্তীর চরিত্র মহাভারত মহাকাব্যের এক অমূল্য সম্পদ। ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। অনুবাদ : রামনারায়ণদত্ত শাস্ত্রী (পাণ্ডেয় রাম); *শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত মহাভারত (সটীক)*; গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর

২। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী; *কৃষ্ণা, কুন্তী এবং কৌন্তেয়*; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮

৩। কালকূট, *পৃথা*, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮৭